শ্রীরামকৃষ্ণ ও তোতাপুরী

দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত

চিকিৎসক, গবেষক ও
স্বনামধন্য সাহিত্যিক

দক্ষিণেশ্বরের আকাশে সূর্য সেদিন যাবার বেলায় আবির ছড়াচ্ছে। হঠাৎ এক ঘূর্ণিঝড় উঠল। তার ধাক্কায় মাঝগঙ্গা থেকে কলকাতা-মুখো এক পানসি চকিতে রানি রাসমণির কালীবাড়ির ঘাটে এসে লাগল। পানসি থেকে নামলেন দীর্ঘকায়, জটাজূটধারী, স্বাস্থ্যবান এক সন্ন্যাসী। পরনে কাপড় প্রায় নেই। সঙ্গে সোনার মতো চকচকে পিতলের লোটা, লম্বা চিমটে, হরিণ চামড়ার আসন আর একটি মোটা চাদর।

মথুরবাবুর নির্দেশে তখন কালীবাড়িতে সাড়ম্বরে সাধুসেবা হয়। সেই সেবার সুনাম দূরদূরান্তের সাধুদের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। এখানে এসে পড়ায় সাধুটি তাই আশ্বস্ত হলেন।

ঘাটের বিস্তৃত চাঁদনিতে উঠে প্রকাণ্ড দেবালয়ের দিকে তিনি এক পলক তাকালেন। তারপরেই তাঁর নজর পড়ল শ্রীরামকৃষ্ণের ওপর। তপোদীপ্ত ভাবোজ্জ্বল মুখটি তাঁকে আকৃষ্ট করল। তিনি বললেন, ‘‘বাচ্চা! কুছ্ সাধন করোগে?’’

‘বাচ্চা’-র বয়স তখন ২৯, সাধুটির বয়স ৫৯ বছর। এই সাধুর নামই তোতাপুরী। বৈদান্তিক, ঘোর মায়াবাদী। এঁকে গুরু মেনে শ্রীরামকৃষ্ণের ‘বেদমতে’ সাধনা ও সন্ন্যাসগ্রহণ।

কোন তোতাপুরী?

শ্রীরামকৃষ্ণের সমসময়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে পাঁচজন বিশিষ্ট সন্ন্যাসী ছিলেন যাঁদের সবার নামই ‘তোতাপুরী’। একজনের সাধনস্থল কুরুক্ষেত্রের কাছে লাদানা গ্রামে বাবা রাজপুরীর ডেরায়।

দ্বিতীয় জন ছিলেন পুরীধামের গির্নারিবন্তার ‘অদ্বৈত ব্রহ্ম আশ্রম’-এ। দক্ষিণেশ্বরের মন্দির কর্তৃপক্ষ শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে এঁরই ছবি ‘গুরু তোতাপুরী’ পরিচয়ে রেখেছেন। কিন্তু এই তোতাপুরী নিজেই তাঁর অনুরাগীদের জানিয়েছিলেন যে তিনি কাউকে সন্ন্যাসদীক্ষা দেননি। তৃতীয় তোতাপুরী ‘অদ্বৈত মঠ’-এর প্রতিষ্ঠাতা পরমহংস আনন্দপুরীকে বেদান্তমতে দীক্ষা দেন। চতুর্থজন লুধিয়ানার মালেরকোটলা শহরের কাছে যোগী মাজরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই তাঁর সাধনা। তিনি ‘ব্রহ্মজ্ঞানী সন্ত বাবা তোতাপুরীজি মহারাজ’ নামে খ্যাত। পঞ্চম তোতাপুরী বিশিষ্ট মাতৃসাধক শ্রীশ্রীকামরাজবাবার শিষ্য। হরিদ্বারের চণ্ডীপাহাড়ে গুরুদেব প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধপীঠ শ্রীশ্রীদক্ষিণাকালীর মন্দিরে তিনি সাধনভজন করেন।

নানা বিচারের পর লাদানা গ্রামে রাজপুরী বাবার ডেরার অষ্টম মোহন্ত তোতাপুরীজিকেই শ্রীরামকৃষ্ণের বেদান্তসাধনার পথপ্রদর্শক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন কর্তৃপক্ষও এঁকেই স্বীকৃতি জানান।

মন্ত্র নেওয়ার সময় হল

লাদানা গ্রাম থেকে তোতাপুরী তীর্থদর্শনে রওনা হন। পুরীধাম ও গঙ্গাসাগর দর্শন শেষে ফেরার পথে তিনি ভুলক্রমে হাওড়া পৌঁছনোর আগেই বালি স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে পড়েন। পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে গঙ্গার ঘাট থেকে একটি পানসি ভাড়া করে কলকাতার দিকে রওনা হন।

সেটি ১৮৬৫ সালের জানুয়ারি মাসের এক সন্ধ্যের কথা। এরপরেই অকস্মাৎ ঘূর্ণিঝড়, ঘটনাচক্রে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে পদার্পণ এবং রামকৃষ্ণদেবকে বেদান্তসাধনার প্রস্তাব প্রদান। হতচকিত রামকৃষ্ণদেব সরলমুখে বলেন, তিনি মায়ের আজ্ঞামতো চলেন। মা অনুমতি দিলে তিনি নিশ্চয়ই সাধনা করবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের মনে পড়ে কদিন ধরে তাঁর মনে হচ্ছে, ভবতারিণী মা যেন তাঁকে কেবলই বলছেন, এবার তোকে একটা মন্ত্র নিতে হবে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ যে মা ছাড়া আর কাউকে জানেন না। এই মন্দির ছেড়ে তিনি কোথাও যেতেও চান না। যেমনভাবে মায়ের কৃপায় তান্ত্রিক ভৈরবী, জটাধারী রামাইত সাধু প্রমুখ এখানে এসেই শ্রীরামকৃষ্ণকে পথ দেখিয়েছেন তেমনভাবে কোনও গুরু এখানে উপস্থিত হয়ে যদি তাঁকে মন্ত্র দেন!

রাত্রি তখন দ্বিপ্রহরের অধিক। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রত্যাদিষ্ট হলেন—তোর গুরু এসেছেন, পানসি করে এখানে আনিয়েছি, তুই এই বেলা তাঁর কাছে যা। তিনি তোকে মন্ত্র দেবেন।

ঘরবাড়ির বদ্ধ পরিবেশ তোতাপুরীর পছন্দ নয়। তিনি রাত্রিবাস করছিলেন দক্ষিণেশ্বর মন্দির চত্বরে পঞ্চবটীর কাছে মাধবীলতা গাছতলায় ধুনি জ্বালিয়ে। এই গাছ শ্রীরামকৃষ্ণ বৃন্দাবন থেকে আনিয়েছিলেন। এর পাশে ছিল এক খড়ে-ছাওয়া পশ্চিমমুখী মাটির কুটির, তার পুবে ও দক্ষিণে দুটি জানলা। শ্রীরামকৃষ্ণ দৌড়ে এলেন সেই ঘরের কাছে। দুয়ারে ধাক্কা দিলেন।

তোতাপুরী বললেন, কৌন হ্যায়?

—আমি।

—তোম কৌন হ্যায়?

—আমি রামকৃষ্ণ।

—রাতমে হামরা পাস ক্যা মাঙতা?

—মা আমায় পাঠিয়েছেন।

—মা কৌন হ্যায়? তেরা মা কো তো হাম জানতা নেহি।

দুয়ারের বাইরে থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণ জানালেন, মা বলেছেন আপনার নাম তোতাপুরী। আপনি আমার গুরুদেব। মা আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।

কথাগুলি শুনে তোতাপুরী অবাক হলেন। বাইরে বেরিয়ে এলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তোতাপুরীকে প্রণাম করলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের তন্ত্রসাধনার গুরু ভৈরবী মায়ের কিন্তু তোতাপুরীকে শ্রীরামকৃষ্ণের গুরু হিসেবে গ্রহণ করায় আপত্তি ছিল, আপত্তি ছিল বেদান্তসাধনের বিষয়েও। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে বলেছিলেন, "এঁর অনুকরণ করতে গেলে তোমার ভক্তিভাবের উচ্ছেদ হবে। এই আশঙ্কায় তোমার বেদান্ত-সাধন অনুমোদন করি না।"

সেই দ্বিধা কাটাতেই সম্ভবত শ্রীরামকৃষ্ণ মা জগদম্বার নির্দেশের অপেক্ষা করছিলেন। সারদা দেবীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখা প্রসঙ্গেও ভৈরবী মায়ের আপত্তি টেঁকেনি। তোতাপুরী সেই আপত্তির প্রতিবাদ করে বলেছিলেন, স্ত্রী-পুরুষে যিনি সমজ্ঞান করতে পারেন তিনি খাঁটি ব্রহ্মজ্ঞ।

প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞ মনে করেন ঈশ্বরই একমাত্র সত্য, জগৎ মিথ্যা। বড় দুরূহ এই সাধনা, উচ্চতম এই দার্শনিক অনুভব। শাস্ত্র অনুসারে সাধনার প্রাথমিক অবস্থা হল বাহ্যিক পূজা বা বিগ্রহপূজা। উন্নতির আকুতিতে পৌঁছতে হবে পরবর্তী স্তরে, তা হল মানসিক প্রার্থনা। কিন্তু সর্বোচ্চ স্তর—সর্বত্র ঈশ্বরকে অনুভব। [মহানির্বাণতন্ত্র ৪।১২]

এই সাধনার জন্য প্রয়োজন সন্ন্যাস। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের এই ব্যাপারে ব্যক্তিগত অসুবিধা ছিল। বালকবয়সে মাকে তিনি কথা দিয়েছিলেন, তিনি কখনও সন্ন্যাস নিয়ে ঘর ছাড়বেন না। এখন তাঁর বৃদ্ধা মা জীবিত শুধু নয়, দক্ষিণেশ্বরেই থাকছেন, নহবতখানার ওপরে। জ্যেষ্ঠপুত্র রামকুমার এবং নাতি অক্ষয়ের অকালপ্রয়াণ সহ্য করতে হয়েছে তাঁকে। এবার শ্রীরামকৃষ্ণ সন্ন্যাসের বেশ ধারণ করলে তা তাঁর পক্ষে আরও শোকাবহ হবে।

তোতাপুরী বিষয়টি বুঝলেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে সন্ন্যাসীর বাহ্যিক রূপ ধারণ করতে হল না।

গবেষক পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় আর একটি সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন: "নাগা সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী তোতাপুরীজির পক্ষে শিষ্যকে গেরুয়া কাপড় দেবার সম্ভাবনা ছিল বলেও মনে হয় না। এমনকী ষাটের দশক পর্যন্ত বাবা রাজপুরী ডেরার সাধুরা কেউ গেরুয়া পরতেন না। উলঙ্গ না থেকে সাদা কাপড় পরতেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসনাম সম্পর্কেও পার্থপ্রতিমবাবু একটি যুক্তিযুক্ত সম্ভাবনার কথা বলেছেন, "...লাদানার ডেরার সাধুদের নামগুলি দেখলে মনে হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে পূর্বাশ্রমের নামটির সঙ্গেই 'পুরী' শব্দটি যোগ করা হয়েছে। যেমন, 'রাজু' বা 'রাজ' হয়েছেন 'রাজপুরী'। চেতনপুরী, হাজারীপুরী, গোপালপুরী, কেদারপুরী, ছোটুপুরী—এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষেত্রেও মনে হয় পিতৃদত্ত [পারিবারিক]

'রামকৃষ্ণ' নামটি বজায় রেখেছিলেন তোতাপুরীজি। অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাস নাম সম্ভবত 'রামকৃষ্ণপুরী'।"

'আমি'-র সাধনা

যাই হোক, তোতাপুরীর নির্দেশ শিরোধার্য করে শুরু হল শ্রীরামকৃষ্ণের বেদান্তসাধনা। তাঁর এতদিন ছিল 'তুমি'-র সাধনা, অর্থাৎ জগন্মাতাকে অবলম্বন করে সাধনা। এখন শুরু হল 'আমি'-র সাধনা, অর্থাৎ তোতাপুরীর নির্দেশে নিজের স্বরূপ অন্বেষণ। সেদিন রাত্রি অবসানে শুভ ব্রাহ্মমুহূর্তে গুরুশিষ্য পদার্পণ করলেন পঞ্চবটীর সাধন কুটিরে।

তোতাপুরী নানা শাস্ত্রবাক্য উচ্চারণ করে বেদান্তের উচ্চভাবে শিষ্যকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন : নামরূপের সীমার মধ্যে যা কিছু অবস্থিত তা কখনও নিত্যবস্তু হতে পারে না। তাকে ছুঁড়ে ফেলো। নামরূপের শক্ত খাঁচা সিংহের বিক্রমে ভেঙে ফেলে তার বাইরে বেরিয়ে এসো। আত্মতত্ত্বের অন্বেষণে ডুবে যাও।

শ্রীরামকৃষ্ণের কিন্তু অসুবিধে হচ্ছিল। তিনি পরে শিষ্যদের কাছে স্মৃতিচারণ করেছেন, "...ধ্যান করিতে বসিয়া চেষ্টা করিয়াও মনকে নির্বিকল্প করিতে বা নামরূপের গণ্ডী ছাড়াইতে পারিলাম না। অন্য সকল বিষয় হইতে মন সহজেই গুটাইয়া আসিতে লাগিল, কিন্তু ওইরূপে গুটাইবামাত্র তাহাতে শ্রীশ্রীজগদম্বার চিরপরিচিত চিদ্‌ঘনোজ্জ্বল মূর্তি জ্বলন্ত জীবন্তভাবে সমুদিত হইয়া সর্বপ্রকার নামরূপ ত্যাগের কথা এককালে ভুলাইয়া দিতে লাগিল।" পরপর তিনদিন একই অনুভূতির পুনরাবৃত্তি হল। বিফলমনোরথ শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর গুরুকে বললেন, "হল না, মনকে সম্পূর্ণ নির্বিকল্প করে আত্মধ্যানে মগ্ন হতে পারলাম না।"

উত্তেজিত তোতাপুরী সক্রোধে বললেন, "কিঁউ হোগা নেহি!"

ঘরের সামনের মাটি থেকে একটা কাচের টুকরো তুলে এনে তার ছুঁচলো অংশটা সজোরে রামকৃষ্ণের দুই ভুরুর মাঝখানে বিঁধে দিয়ে বললেন, "এইখানে মনকে গুটিয়ে আনো।"

দৃঢ়সংকল্প শ্রীরামকৃষ্ণ আবার ধ্যানে বসলেন। তাঁর কি মনে এল প্রিয় সেই রামপ্রসাদী গানের কথাগুলি : 'কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি'? আগের তিনদিনের মতো আবার জগদম্বার মাতৃমূর্তি তাঁর মনে উদিত হল। কিন্তু এবার তিনি প্রস্তুত ছিলেন, অদ্বৈতবাদের যে-জ্ঞান গুরু তোতাপুরী তাঁকে এতদিন শেখালেন তাকেই তরোয়ালের মতো ব্যবহার করে ওই মানস-বিগ্রহকে তিনি দ্বিখণ্ডিত করলেন। আর কোনও বাধা রইল না। মন একেবারে হু হু করে নামরূপের রাজ্যের অনেক উপরে উঠে গেল। শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিমগ্ন হলেন।

তোতাপুরী কিছুক্ষণ শিষ্যের পাশে বসে থাকলেন। তারপর নিঃশব্দে কুটিরের বাইরে বেরিয়ে এলেন। না বুঝে কেউ যাতে বিরক্ত না করে তাই দরজায় তালা লাগিয়ে কাছেই নিজের থাকার জায়গায় ধুনির পাশে এসে বসলেন। শিষ্য কখন দোর খুলে দেওয়ার জন্য ডাক দেয় তার অপেক্ষা করতে লাগলেন। টানা তিনদিন পেরিয়ে যাওয়ার পর তোতাপুরীর দুশ্চিন্তা হল। তিনি তালা খুলে কুটিরে প্রবেশ করে দেখলেন যেমনভাবে বসিয়ে গিয়েছিলেন

তাঁর শিষ্য তেমনভাবেই বসে আছেন—দেহে প্রাণ আদৌ আছে কী না বোঝার উপায় নেই। কিন্তু তাঁর জ্যোতিঃপূর্ণ অবয়ব, ধ্যানগম্ভীর প্রশান্ত মুখচ্ছবি বুঝিয়ে দিচ্ছে এই মানুষটির মধ্যে এক অলৌকিক প্রাণস্পন্দনের উপস্থিতি।

তোতাপুরী স্তম্ভিত। দীর্ঘ চল্লিশ বছরের কঠোর সাধনায় তিনি যে-উপলব্ধি অর্জন করতে পেরেছেন এই যুবা মহাপুরুষ কি সত্যিই মাত্র তিনদিনের চেষ্টায় তা আয়ত্ত করলেন? সন্দিহান তোতাপুরী বারবার শিষ্যের দেহে প্রকাশিত লক্ষণগুলি পরীক্ষা করতে লাগলেন। সমাধির উচ্চতম স্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ এখন অবস্থান করছেন। অবাক আনন্দে পুরীজী চিৎকার করে উঠলেন, "ইয়ে ক্যা দৈবী মায়া!"

পরম স্নেহে আর শ্রদ্ধায় শিষ্যের শরীর স্পর্শ করে 'হরি ওম্' মন্ত্রের পুনঃপুনঃ উচ্চারণে পঞ্চবটীর চারপাশ তোলপাড় করে তুললেন তিনি। ধীরে ধীরে শ্রীরামকৃষ্ণ চোখ মেললেন।

নিজের গুরুভাই যেন

নির্বিকল্প সমাধির উচ্চতম স্তরে পৌঁছে যাওয়ার পরেও শ্রীরামকৃষ্ণ সন্ধ্যেবেলা হাততালি দিয়ে মায়ের নাম করেন। তোতা তাতে অবাক হন। বিদ্রূপও করেন। তাঁদের দেশে দুহাত দিয়ে যেমনভাবে রুটি বানায় তাঁর শিষ্য যেন তেমন ভঙ্গি করছেন। তিনি হাসতে হাসতে বলেন, "কিঁউ রোটি ঠোকতে হো?"

অকৃত্রিম গ্রাম্য সারল্যে শিষ্য উত্তর দেন, "দূর শালা! আমি ঠাকুরের নাম করছি আর তুমি কিনা বলছ, আমি রুটি ঠুকছি!"

অন্য অনেক বৈদান্তিকের মতোই তোতার ধারণা ছিল ভক্তির পথ নিম্ন অধিকারীর জন্য। যে একবার অদ্বৈত সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছে সে কেন আবার বিগ্রহপূজায় সময় নষ্ট করবে? তাঁর ভাষায়, "শিরকা টোপি হো কে কাহে পায়ের কি জোড়া [জুতো] হোতা হ্যায়?"

এবার শিষ্যের কাছে গুরুর শিক্ষা শুরু। শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝিয়ে বলেন, "কালীরূপ... চৌদ্দ পোয়া কেন? দূরে বলে। ... যেমন, দীঘির জল দূর থেকে সবুজ, নীল বা কালোবর্ণ দেখায়। কাছে গিয়ে হাতে তুলে দেখ—কোন রঙ নেই।" বোধের থেকে দূরে যখন তখন বিগ্রহের প্রয়োজন। ভাবে লীন হয়ে গেলে আর তার প্রয়োজন নেই। শ্রীরামকৃষ্ণ মাঝে মাঝেই তাঁর এক প্রিয় গান গেয়ে ওঠেন, সেখানেও একই কথার প্রতিধ্বনি, "তুমি আদ্যাশক্তি মা গো তুমি পঞ্চতত্ত্ব।/ কে জানে তোমারে মাগো তুমিই তত্ত্বাতীত॥/ (ও মা), ভক্ত জন্য চরাচরে তুমি যে সাকার।/ পঞ্চে পঞ্চ লয় হলে তুমি নিরাকার॥"

শ্রীরামকৃষ্ণের অনুভূতির তীব্রতা তোতাজীকেও স্পর্শ করে। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন আপনমনে গেয়ে ওঠেন, "জীব সাজ সমরে রণবেশে কাল প্রবেশে তোর ঘরে", অথবা "দোষ কারো নয় গো মা, আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা"—অবাক হয়ে দেখেন গান শুনতে শুনতে তোতাপুরীর দুচোখ বেয়ে জল পড়ছে। ভাবেন, "ন্যাংটা মানে না বুঝেই কাঁদতে লাগল।" আসলে আক্ষরিক অর্থ তো নয়, তোতাপুরী বুঝে নিচ্ছেন গানের ভাব—যেখানে সাকার নিরাকার একাকার হয়ে যাচ্ছে। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাইপো হলধারীর সঙ্গে তিনি

'অধ্যাত্ম-রামায়ণ' চর্চা করতেও শুরু করলেন।

তোতাপুরী তাঁর পিতলের লোটাটি রোজ মাজতেন। সোনার মতো ঝকঝকে করে রাখতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন প্রশ্ন করলে তিনি বললেন—ঘটি রোজ মাজতে হয়, যেমন মনকে রোজ ধ্যান করে পরিষ্কার রাখতে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রত্যুত্তর—কিন্তু ঘটিটি যদি সোনার হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণের কথার ইঙ্গিতটি তোতাপুরীর বুঝতে অসুবিধা হল না। বুঝলেন এই শিষ্যের কাছ থেকে তাঁরও অনেক কিছু শেখার আছে।

আর একদিনের কথা। তোতাপুরীর সামনে সর্বদা ধুনি জ্বলত। তিনি সেই অগ্নিকে এতই পবিত্র বলে মনে করতেন যে কোনও গৃহস্থ বা অন্য কোনও মানুষকে তা স্পর্শ করতে দিতেন না। সেদিন তিনি ধুনির সামনে বসে আছেন, এমন সময় এক ভারী এসে সেই ধুনি থেকে একটু আগুন নিতে গেল। ভয়ানক রেগে গেলেন তোতাজী। লোকটিকে গালাগালি দিতে দিতে চিমটে ছুঁড়ে মারতে গেলেন। কাছেই বসেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি হাসতে হাসতে বললেন, "দূর শালা, তোর এই ব্রহ্মজ্ঞান? এখনও এত ভেদবুদ্ধি? সর্বভূতে ব্রহ্ম, তাহলে এই মানুষটিও কি ব্রহ্ম নয়?" তোতাপুরী ভুল স্বীকার করে নিলেন, "হ্যাঁ তোম্ ঠিক বাতায়া, ভাই ঠিক বাতায়া, মেরা কসুর হুয়া হ্যায়!"

পরিব্রাজনের নিয়ম মেনে তোতাপুরী সাধারণত তিনদিনের বেশি কোথাও থাকতেন না। কিন্তু শিষ্যের আকর্ষণে এমনভাবে বাঁধা পড়ে গেলেন যে সৎপ্রসঙ্গে ব্রহ্মচিন্তায় টানা এগারো মাস তিনি দক্ষিণেশ্বরে কাটালেন। এখন শ্রীরামকৃষ্ণ আর তাঁর শিষ্য নন, নিজের গুরুভাই যেন—উভয়ই উভয়ের কাছ থেকে জ্ঞান ও অনুভবের আদানপ্রদান চালাতে পারেন। শেষের দিকে তোতাজী শ্রীরামকৃষ্ণকে 'পরমহংসজী' বলে ডাকতে থাকেন। তাঁকে অনুসরণ করে এবার কালীবাড়ি চত্বরের অনেকেই তাঁদের ছোট ভটচায্যিকে 'পরমহংস' বলে ডাকা শুরু করেন।

কে প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণকে 'পরমহংস' উপাধি দেন তাই নিয়ে মতভেদ আছে। দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের কাছেই এক সরকারি বারুদখানা ছিল। শিখ সিপাহিরা ছিল তার রক্ষী। ধর্মপ্রাণ কুয়ার সিং তাদের অন্যতম। শ্রীরামকৃষ্ণকে তারা সবাই খুব ভক্তিশ্রদ্ধা করত। আত্মভোলা শ্রীরামকৃষ্ণকে বেলতলায় মহানন্দে ঘুরতে দেখে তারা অনেক সময় বলত, "আরে, ইয়ে তো পরমহংস হ্যায়।"

বেদান্তের জ্ঞানে আত্মস্থ যে-সন্ন্যাসী 'আমি ব্রহ্ম' বিশ্বাসে স্থির তাঁকেই পরমহংস বলা হয়। পরমহংস শব্দের আক্ষরিক অর্থ সর্বোত্তম রাজহাঁস। রাজহাঁস যেমন জলে ও স্থলে সমানভাবে থাকতে পারে পরমহংস ঋষিও তেমনই বস্তু ও আত্মার রাজ্যে সমান স্বতঃস্ফূর্ততায় বিরাজ করতে পারেন।

সেনাদের পক্ষে এত তত্ত্বকথা জানা তো সম্ভব নয়, তারা তাদের পশ্চিম দেশে দেখে এসেছে কিছু সাধুকে 'পরমহংস' বলে সম্মান জানানো হয়। সেই পশ্চিম দেশ থেকেই আগত এক ব্রহ্মজ্ঞানী যাবতীয় শাস্ত্রবাক্য বিচার করে তাঁর শিষ্যকে 'পরমহংস'-এর মর্যাদা দিলেন। সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণের 'পরমহংস' উপাধি প্রদানকারী হিসেবে তোতাপুরীকেই স্বীকৃতি জানাতে হবে।

শিষ্যকে সর্বোচ্চ স্বীকৃতি জানিয়ে গেলেন তোতাপুরী, যে-উপাধি প্রজন্মের পর প্রজন্মে শ্রীরামকৃষ্ণের নামের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে গেল। আর বিনিময়ে তাঁর গুরুদেবের শুষ্ক ব্রহ্মজ্ঞানকে মাতৃসুধারসে সরস করে দিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

কেমন করে? শ্রীরামকৃষ্ণ-তোতাপুরী যোগাযোগের সে এক বড় অলৌকিক আখ্যান।

তোতাপুরীর জগদম্বা দর্শন

শিষ্য পরমহংসের সঙ্গে ধর্ম-আলোচনায় বুঁদ তোতাপুরী যথার্থ পরিব্রাজনের নীতি বিস্মৃত হয়ে মাসের পর মাস আটকেছিলেন দক্ষিণেশ্বরে। কিন্তু সদা প্রবাহিত প্রবল বেগবান নদ আটকে পড়লেও পলি পড়ে পড়ে তার নাব্যতা কমে, পানা জমে জমে জড়িয়ে ধরে তার সম্মুখ গতি। তেমন করে বাংলার আর্দ্র বাতাস, নাতি-বিশুদ্ধ পানীয় জল, অনভ্যস্ত রান্না তোতাপুরীর পাথুরে পশ্চিমি শরীরে থাবা বসাতে লাগল। প্রবল রক্ত-আমাশয় রোগে তিনি আক্রান্ত হলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মথুরবাবুকে বলে গুরুদেবের চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন: ওষুধ এবং পথ্য। কিন্তু তাতে কোনও সুরাহা হল না।

প্রথম প্রথম তোতাজী তাঁর এই শারীরিক যাতনাকে উপেক্ষা করতে চেষ্টা করছিলেন। জপধ্যান ও শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্গসুখে তাঁর মনকে আরও ডুবিয়ে দিতে চাইছিলেন। মনকে বোঝাতে চাইছিলেন, যে-শরীর ক্রমশ কৃশ, জলশূন্য, দুর্বল হয়ে যাচ্ছে সে তো তিনি নন! সেই শরীরের যন্ত্রণায় তাঁর মতো যোগীর কী এসে গেল? সে-শরীর বিনষ্ট হলেই বা তাঁর কী?

এক রাত্রে তাঁর সেই উপেক্ষিত শরীর বুঝি তার সর্বশক্তি প্রয়োগ করল। প্রবল শূলবেদনায় ধ্যান তো দূরস্থান, তোতাজী আজ স্থির হয়ে শুতেও পারছেন না। দেহবোধ থেকে মুক্ত হয়ে মনকে উচ্চ সমাধিস্তরে নিয়ে যেতে সিদ্ধহস্ত যোগী কি আজ 'হাড়-মাসসর্বস্ব' তুচ্ছ শরীরটার কাছে হেরে যাবেন?

না, কখনই না। তেজোদৃপ্ত তোতাপুরী সিদ্ধান্ত নিলেন, আজ রাত্রেই এই খাঁচাকে বিসর্জন দিয়ে তিনি মুক্ত হবেন। মুক্তি, মুক্তি, জাগতিক বন্ধন থেকে চিরমুক্তি চাই তাঁর। আজই।

ভবতারিণীর মন্দিরের পাশেই কুলুকুলু প্লাবিত গঙ্গা। তোতাপুরী মনকে ব্রহ্মভাবনায় নিবদ্ধ রেখে নদীর বুকে অবতরণ করলেন। এক পা এক পা করে পা বাড়ালেন নদীর জলে। কিন্তু ভাগীরথীর বুক বুঝি আজ কঠোর বেদান্তযোগীর মতোই শুষ্ক। তোতাপুরী নদীর গভীর থেকে গভীরতর দিকে এগোতে এগোতে প্রায় পৌঁছে গেলেন অপর পারে। কিন্তু কোথাও ডুবজল পেলেন না। বিস্মিত তোতাপুরী মনে মনে বললেন, ডুবে মরবার যথেষ্ট জলও আজ নদীতে নেই; ঈশ্বরের এ কী অপূর্ব লীলা!

আর তখনই তাঁর মন থেকে শুষ্ক জ্ঞানের আবরণ যেন এক টানে কে সরিয়ে দিল। মন যেন এক অলৌকিক আলোয় উদ্ভাসিত হল। তোতা দেখলেন জলে, নদীর পারে, অন্তরিক্ষে সর্বত্র যেন মা উপস্থিত। বিশ্বজননী। মনে হল মা ছাড়া তো আর কিছু নেই। তাঁর সুস্থতা মা, তাঁর যন্ত্রণা মা, উপেক্ষিত শরীর মা, মন মা, মনের পারেও মা। যা দেখছেন, শুনছেন, ভাবছেন, কল্পনা করছেন—সবই মা।

এই চকিত বোধের এক নাটকীয় বর্ণনার শেষে স্বামী সারদানন্দ জানিয়েছেন, "গভীর নিশীথে তোতা ভক্তিপূরিত চিত্তে জগদম্বার অচিন্ত্য অব্যক্ত বিরাট রূপের দর্শন করিতে করিতে, গম্ভীর অম্বারবে দিকসকল মুখরিত করিয়া তুলিলেন এবং আপনাকে তৎপদে সম্পূর্ণরূপে বলি দিয়া পুনরায় যেমন আসিয়াছিলেন, তেমন জল ভাঙিয়া ফিরিয়া চলিলেন। শরীরে যন্ত্রণা হইলেও এখন আর তাহার অনুভব নাই। প্রাণ সমাধি-স্মৃতির অপূর্ব উল্লাসে উল্লসিত!"

ধীরে ধীরে তোতাজী পঞ্চবটীতলে ফিরে এলেন। ধুনির ধারে তাঁর অভ্যস্ত জায়গায় ধ্যানে বসলেন। কিন্তু আজ ধ্যান অন্যরকম। আজ মা জগদম্বার একান্ত ধ্যানে রাত অতিক্রান্ত হল।

ভোরের আলো ফুটতে শ্রীরামকৃষ্ণ এলেন গুরুদেবের শরীর-স্বাস্থ্যের খোঁজ নিতে। তাঁর বসার বলিষ্ঠ ভঙ্গি, প্রসন্ন মুখমণ্ডল দেখে বোঝা যাচ্ছে তোতাপুরী আজ শারীরিক ও মানসিকভাবে অনেক সুস্থ। শ্রীরামকৃষ্ণকে ইশারায় পাশে বসতে বলে গতরাতের সব কথা জানালেন। বললেন—আমার শুধু রোগমুক্তি হল না, রোগ আমাকে অজ্ঞতা থেকে মুক্তি দিয়েছে; রোগ আমার বিশ্বাসের অন্ধত্ব ঘুচিয়েছে; রোগ আমাকে জগদম্বার দর্শন করাল।

অভিভূত শ্রীরামকৃষ্ণ বালকের উচ্ছ্বাসে বলতে থাকলেন, "তবে যে মাকে আগে মানতে না, শক্তির ধারণা সব 'ঝুট' বলে আমার সঙ্গে মিছে তর্ক করতে! আমাকে মা আগেই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, তোমার ব্রহ্ম আর মায়ের শক্তিরূপের মধ্যে তফাত নেই কোনও—যেমন তফাত নেই আগুন আর তার দাহিকা শক্তির।"

মন্দির থেকে ভেসে এল নহবতের প্রভাতি সুর। তোতাপুরী-শ্রীরামকৃষ্ণ একসঙ্গে গেলেন ভবতারিণী দর্শনে। দুজনেই অনুভব করলেন, এখানে তোতাজীর কাজ সফলভাবে সম্পূর্ণ হয়েছে: শ্রীরামকৃষ্ণের বহুমুখী সাধনপথে এক বিশিষ্ট নতুন অভিমুখ তিনি চিনিয়ে দিয়েছেন, সেই সঙ্গে নিজের দীর্ঘ সুকঠোর অদ্বৈতচর্চাকে ভিজিয়ে নিয়েছেন পবিত্র ভক্তিরসে।

কয়েকদিন পরে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে বিদায় নিয়ে, মা ভবতারিণীর কাছে বিদায় নিয়ে তোতাপুরী পশ্চিম দেশে রওনা দিলেন। বরাবরের মতো। দক্ষিণেশ্বরে তিনি আর ফিরে আসেননি কখনও।

সহায়ক গ্রন্থ

১। স্বামী সারদানন্দ, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ*, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০০১

২। পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, *শ্রীশ্রীতোতাপুরী-প্রসঙ্গ*, লেক কালীবাড়ী

৩। সত্যচরণ মিত্র, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস*

৪। বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলামৃত*, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮৩

৫। স্বামী দিব্যসুখানন্দ, *শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনসুধা*, রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ শিক্ষা ও গবেষণা সংস্থা, বেলুড় মঠ

৬। স্বামী জিতাত্মানন্দ, *শ্রীরামকৃষ্ণ-মহাজীবন*, শ্রীরামকৃষ্ণ সত্যানন্দ আলমবাজার মঠ

৭। প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণা, *শ্রীরামকৃষ্ণের দক্ষিণেশ্বর*, শ্রীসারদা মঠ, দক্ষিণেশ্বর, কলকাতা